5 Marks

① শ্যামাসুন্দরী - চরিত্রের সংক্ষিপ্ত :-

কুন্দই - কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বিকাশ ও কাহিনীর পরিণতির দিক। সমাজিক উপন্যাসের শ্যামাসুন্দরী চরিত্রটির প্রয়োজন ছিল। সমাজিকী শ্যামাসুন্দরী ও চরিত্রটি মুখ্যভাবে গুণের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমরা এমনিতেই যেমন সুন্দরী কপালকুণ্ডলার পাশে পাশে আছে, তেমনি সুন্দরী রীতিমত ঈর্ষার জ্বালা বোধ করতে পারি, সুন্দরমনা, কিন্তু - যেভাবে সে কপালকুণ্ডলার সমালোচনা পাত্রে প্রেমিকে- ফলীন সমাজের পত্নী রূপে এই- কিন্তু সুন্দরী মেয়েটির মনোদুঃখের কথাও আমরা মনে করি। শ্যামাসুন্দরী সমাজে প্রতিযোগিতা দেখতে চায়, তার নেই বলে ঈর্ষা করে। তাই সে কপালকুণ্ডলার রীতিমত বিরুদ্ধে লেগে আসে। তবুও, সমস্তক্ষণ শ্যামাসুন্দরীর কম নয়। তবে কপালকুণ্ডলার মনে দেবীর তিনিপ্রকৃত স্বরূপ কথা স্থলে যেমনভাবে ঘিরে ধরেছে, তেমনি সাধিক ঈর্ষা, ঘৃণাভরে তুলে যে বিদ্বেষ্টিনি ঈষৎ সত্যরূপে দেখে নয়। এই সুন্দরী মেয়েটির ফলীন সমাজ রূপে- শ্যামাসুন্দরীর চরিত্র, যে-কোনো কাহিনীটির সত্যি সত্যের সমালোচনা দেখে তুলে ধরে।

—x—

② মেহেরুন্নিসা চরিত্রের সংক্ষিপ্ত :-

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মেহেরুন্নিসা। এই চরিত্রটি না থাকলে, সমগ্র কাহিনীটির মূল্য অনেকখানি কমে যেত। মেহেরুন্নিসা, প্রথম জীবনে ছিল বিক্রমপুরের মসনদার- মেহের-তনয়ার পত্নী। তার এই ঐতিহাসিক নারী চরিত্রটি উপন্যাসিকের কল্পনাপ্রসূত। মেহেরুন্নিসার প্রতিদ্বন্দ্বী - চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। মেহেরুন্নিসার প্রতি মেহেরুন্নিসার ভালোবাসার প্রকাশ, এমন কি তার পেছনে সুন্দরী- সমাজ তারও ঈর্ষা - করে মূল স্বামী নবকুমারের প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে পারে। মেহেরুন্নিসার আত্মসমর্পণের, স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধ, মেহেরুন্নিসার ফুলমনের মেহেরুন্নিসার প্রতি ভালোবাসা, এই, এই বিষয়গুলি লেখক তার চরিত্র- সাথে করে তুলেছেন।

—x—

Scanned with CamScanner

৩) কালাপাহাড় চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ-

কালাপাহাড় – আসল নাম রাজীব। তিনি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি তাঁর পুত্রকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজীব তা গ্রহণ করেনি। সে ছোটবেলা থেকেই বিদ্রোহী স্বভাবের ছিল। সে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিল। সে মনে করত, মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত মানবতা। সে বিশ্বাস করত, ঈশ্বর এক এবং তিনি সকল মানুষের জন্য সমান। তাই সে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ মানত না। সে বলত, "মানুষ মানুষের জন্য, ধর্ম মানুষের জন্য।" তার এই বিশ্বাস তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল।

রাজীব ছিল একজন সাহসী যুবক। সে অন্যায় ও অবিচার সহ্য করতে পারত না। সে সবসময় দুর্বল ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াত। তার এই গুণের জন্য সবাই তাকে ভালোবাসত। সে ছিল একজন ভালো বন্ধু। বন্ধুদের বিপদে সে সবার আগে এগিয়ে আসত। সে নিজের জীবনের মায়া না করে অন্যকে সাহায্য করত। তার এই মহৎ গুণগুলো তাকে সবার কাছে প্রিয় করে তুলেছিল।

রাজীব ছিল একজন মেধাবী ছাত্র। সে পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। সে সবসময় ক্লাসে প্রথম হত। তার শিক্ষকরা তাকে খুব স্নেহ করতেন। তারা তার মধ্যে ভবিষ্যতের একজন সফল মানুষের ছাপ দেখতে পেতেন। কিন্তু তার বিদ্রোহী মনোভাব তাকে অনেক সমস্যায় ফেলে দিত। সে কখনো অন্যায়ের সাথে আপস করত না। এই কারণে অনেক শিক্ষকের সাথে তার মতবিরোধ হত।

রাজীবের জীবনে একটি বড় পরিবর্তন আসে যখন সে একজন সুফী সাধকের সংস্পর্শে আসে। সুফী সাধক তাকে শেখান যে, ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য কোনো মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক মানুষ নিজের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারে। এই কথা রাজীবের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। সে বুঝতে পারে যে, ধর্মের নামে যে ভেদাভেদ ও হানাহানি চলছে, তা সম্পূর্ণ ভুল। সে তখন থেকে সত্যের সন্ধানে বের হয়।

সত্যের সন্ধানে বের হয়ে রাজীব অনেক কষ্ট সহ্য করে। সে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে যায়। কিন্তু সে তার লক্ষ্য থেকে সরে আসে না। অবশেষে সে সত্যের দেখা পায়। সে বুঝতে পারে যে, সত্য কোনো বই বা ধর্মগ্রন্থে সীমাবদ্ধ নয়। সত্য হলো মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসা, সহানুভূতি ও মানবতা। এই সত্য উপলব্ধি করার পর রাজীব সম্পূর্ণ বদলে যায়।

সত্যের সন্ধান পাওয়ার পর রাজীব নিজেকে মানবতার সেবায় উৎসর্গ করে। সে সকল ধর্মের মানুষকে ভালোবাসতে শুরু করে। সে হিন্দু-মুসলমান সবার কাছে সমান প্রিয় হয়ে ওঠে। সে বলত, "আমি কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নই, আমি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।" তার এই কথা অনেক মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। অনেকে তার বিরোধিতাও করে, কিন্তু সে কখনো পিছপা হয়নি।

রাজীবের জীবনের শেষ দিকে সে একটি বড় সত্য আবিষ্কার করে। সে বুঝতে পারে যে, মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তার অহংকার। অহংকার মানুষকে অন্ধ করে দেয়, তাকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। তাই সে অহংকার ত্যাগ করে সম্পূর্ণ বিনয়ী হয়ে ওঠে। সে ছোট-বড় সবার সাথে সমান ব্যবহার করত। সে কখনো কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করত না।

রাজীবের মৃত্যু ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ। সে তার শেষ দিনগুলো ধ্যান ও প্রার্থনায় কাটিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তার জন্য কেঁদেছিল। সে কোনো ধর্মের মানুষ ছিল না, সে ছিল সকল ধর্মের মানুষের। তার জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সত্য ও ভালোবাসাই হলো জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম।

—x—

৪) অর্ফিকারী চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ-

অর্ফিকারী ছিল একজন ধনী ব্যবসায়ী। সে ছিল খুব চালাক ও ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ। তার মূল লক্ষ্য ছিল টাকা। সে যেকোনো উপায়ে টাকা আয় করতে চাইত। তার কাছে মানুষের কোনো মূল্য ছিল না। সে মানুষকে ব্যবহার করত নিজের স্বার্থে। কাজ শেষ হলে সে মানুষকে ফেলে দিত। তার এই স্বভাবের জন্য সবাই তাকে ঘৃণা করত।

অর্ফিকারী ছিল খুব লোভী। তার লোভের কোনো শেষ ছিল না। সে সবসময় আরও বেশি টাকা চাইত। তার এই লোভ তাকে অন্ধ করে ফেলেছিল। সে ভালো-মন্দ বিচার করতে পারত না। সে শুধু দেখত কীভাবে আরও লাভ করা যায়। এই লোভের কারণে সে অনেক বড় বড় ভুল করেছে। তার লোভ তাকে একসময় ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছিল।

অর্ফিকারী ছিল একজন নিষ্ঠুর মানুষ। সে দয়া-মায়া বলতে কিছু বোঝত না। সে গরিব মানুষের রক্ত চুষে ধনী হয়েছিল। সে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দিত না। সে তাদের দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে নিত। কেউ প্রতিবাদ করলে সে তাকে চাকরি থেকে বের করে দিত। তার কারখানায় শ্রমিকদের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। অনেক শ্রমিক দুর্ঘটনায় মারা গেলেও সে কোনো ক্ষতিপূরণ দিত না।

অর্ফিকারী ছিল একজন ভণ্ড ব্যক্তি। সে বাইরে খুব ধার্মিক সাজার চেষ্টা করত। সে নিয়মিত নামাজ পড়ত এবং দান-খয়রাত করত। কিন্তু এসব কাজ সে করত শুধু লোক দেখানোর জন্য। তার মনে কোনো ধর্মবোধ ছিল না। সে ধর্মকে ব্যবহার করত নিজের স্বার্থে। সে জানত যে, ধার্মিক সাজলে মানুষ সহজে বিশ্বাস করে। তাই সে এই ভণ্ডামিটা করত।

অর্ফিকারী ছিল একজন স্বার্থপর মানুষ। সে শুধু নিজের কথা ভাবত। তার পরিবার, বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন কারো প্রতি তার কোনো টান ছিল না। সে কাউকে ভালোবাসত না। সে কারো সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়াত না। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সে নিজে। সে নিজের সুখ ছাড়া আর কিছু বুঝত না। এই স্বার্থপরতা তাকে সমাজে একঘরে করে তুলেছিল।

—x—

Scanned with CamScanner